গণআত্মহত্যা

গণআত্মহত্যা

এম. এ. আর. রোকন

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা

৩৪ নর্থব্রুক হলো রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

গণআত্মহত্যা

প্রকাশকাল: অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২২
প্রচ্ছদ: তানভীর এনায়েত

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হলো রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

GonoAttmohottya by M A R Rukon
Published by Projonmo Publication
Copyright © M A R Rukon
ISBN: 978-984-95878-9-7

উৎসর্গ

আম্মু, মামু এবং তোমাদের মতো যন্ত্রণা বিনিয়োগ করতে যারা কখনোই কর্পণ্য করেনি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর সকল শুভাকাঙ্ক্ষী।

গল্পের ঘটনাপ্রবাহ ১৯৯০-২০১২

কুয়াশা পুরো প্ল্যাটফর্মটাকে গিলে ফেলেছে। ডিসেম্বরের শেষে এসে এমন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়ায় রেলস্টেশন প্রায় পুরোটাই ফাঁকা। হাতেগোনা কয়েকজন যাত্রী মাত্র। যাদের মধ্যে রয়েছে কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, ডাক বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় কৃষক। এরা প্রায় প্রতিদিনই যাতায়াত করে। কৃষকরা ভালো দামের আশায় সবজি নিয়ে শহরে যায়। সকাল সাড়ে সাতটার এই লোকাল ট্রেনটাই তাদের একমাত্র মালবাহী ট্রেন।

অনেকক্ষণ ধরে ট্রেনটা অপেক্ষা করছে। কৃষকরাও কাঁধে রাজ্যের ব্যস্ততা নিয়ে দ্রুত কাজ শেষ করতে চাইছে। কিন্তু ভারী ভারী সবজির বস্তা তুলতে যথেষ্ট শ্রম আর সময়ের প্রয়োজন।

ট্রেনের টিকেট মাস্টার মোসাদ্দেক হোসেন কামাল প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০ টাকা করে ভাড়া আদায় করে। যদিও মূল ভাড়া ২৫ টাকা। তাই সহজেই অনুমান করা যায় আদায়কৃত সেই অর্থ কখনোই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় না। টাকার একটা বড় অংশ কামাল আর ট্রেনের সহকারী চালক মতি মিয়ার মধ্যে ভাগাভাগি হয়। বাকিটা লাইনম্যান ও অন্যান্যরা পায়।

গফুর সাহেব হলেন ট্রেনের প্রধান চালক। তবে উনি মোটেও এইসব পছন্দ করেন না। উনি ঈমানদার লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন। লম্বা দাঁড়িও রেখেছেন। সেই দাঁড়ি অতি লম্বা হওয়ায় সবসময় গিট্টু দিয়ে রাখেন। ট্রেনের প্রধান চালক হওয়ার সুবাদে ওনাকে সবাই উস্তাদ বলে ডাকে।

গফুর সাহেব ২০০১ সাল থেকে এই রোডে ট্রেন চালাচ্ছেন। আর এখন ২০১২ সাল শেষ হতে চলল। আজ প্রায় এক যুগ। একেতো তিনি ঝানু ড্রাইভার তার উপর আবার দীর্ঘ সময়ের ট্র্যাক রেকর্ড। তাই বলাই যায়, উনার কাছে এই রোড নিজের বাড়ির রাস্তার চেয়েও বেশী পরিচিত। রোডের প্রতিটি বাঁক হাতের তালুর মতো চেনা।

গফুর সাহেব চোখ বন্ধ করেও বলে দিতে পারেন জামালপুরের পর নান্দিনা তারপর পিয়ারপুর, নুরুন্দি। এরপর নিমতলী, বিদ্যাগঞ্জ হয়ে সর্বশেষ ময়মনসিংহ। তিনি ভালো করেই জানেন ট্রেনটাকে কখন, কোথায়, কতবার থামাতে হবে? কিংবা কতটা সময় লাগবে শেষ গন্তব্যে পৌঁছাতে?

গফুর সাহেব সব সময় বলেন, শুধু ইঞ্জিন গরম করলেই ভালো ড্রাইভার হওয়া যায় না। মাথায় রাখতে হয় আপনি কোন দিন গাড়ি চালাচ্ছেন? কোন অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছেন?

এই যেমন মানুষ সারা বছর পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শুধু মাত্র পরিবারের জন্য। সেই পরিবারের সাথে, প্রায় অপরিচিত হয়ে যাওয়া স্থানীয় বন্ধুবান্ধবের সাথে কিংবা অতি বয়স্ক কোন মুরব্বির সাথে শেষবার দেখা করতে সবাই ঈদকেই বেছে নেয়। ঈদের দিনটাকে বেড়ে উঠা আপন গ্রামে সকলের সাথে উদযাপন করতে চায়। তাই প্রতি বছর ঈদের সময় একটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। গফুর সাহেব তখন ট্রেনটাকে ঘন্টা দুয়েক লেট করাতে কোন কার্পণ্য করেন না।

তিনি চান সবাই যাতে কোনো মতে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরতে পারে। হাঁপিয়ে উঠা দাসরা যাতে একটু বুক ভরে নির্ভেজাল অক্সিজেন নিতে। সত্যি বলতে মাঝে মাঝে নিয়ম ভাঙতে হয় যেন সব সুখ সুবিধাবাদিরা একা ভোগ করতে না পরে। আবার মাঝে মাঝে নিয়ম গড়তেও হয় যেন বেপরোয়া রাজ্যটাকে গ্রাস করতে না পারে।

মতি মিয়া লাইনম্যান মজনুকে ইশারা করে বুঝিয়ে দিল ৮:১৫ বাজে। অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর না। এখন ট্রেনটা ছাড়তে হবে। মজনু শেষবারের মতো সব দেখে নিল। তারপর হাতে থাকা বাঁশিটা ঠোঁটে চেপে রেফারির মতো করে একটা জোরে ফুঁ দিল।

অথচ মজনু জানেই না আজ সে ইসরাফিলের ভূমিকা পালন করছে। তার হাতে থাকা বাঁশিটা ইসরাফিলের শিঙা হয়ে গেছে। আজকে এই বাশিঁর আওয়াজ সবকিছুকে ধ্বংসের আহ্বান জানাচ্ছে। গফুর সাহেবও কি ভাবতে পারছেন উনার চেনা রাস্তায় উনি হারিয়ে যাবেন?

আর যারা রোজ যাতায়াত করে অভ্যস্ত, সেই কৃষকরা, ছাত্রছাত্রীরা কিংবা ডাক বিভাগের কর্মকর্তারা, তারা কি আর কখনো এই পথে নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবে?

আজ সম্পূর্ণ নতুন একটা গল্প সৃষ্টি হবে। যার মধ্যদিয়ে মানব সভ্যতা সত্যযুগ থেকে সরাসরি কলিযুগে প্রবেশ করবে। যে গল্প যুগ যুগ ধরে মানুষজন টি-স্টলে বসে রসিয়ে কসিয়ে বলতে পারবে। নিউজ পেপারগুলা বড় বড় অক্ষরে মসলাদার হেডলাইন তৈরী করবে। ভয়ে হয়তো অনেক মানুষের রাতের ঘুম হারাম হয়ে যাবে।

হতে পারে কোন একদিন সেই গল্প নিয়ে একটা হিমশীতল থ্রিলার সিনেমা নির্মাণ করা হবে। কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হবে। সত্যি বলতে, সব দূর্ঘটনাই কোন না কোন সুযোগ সন্ধানি ব্যবসা। এতে কেউ না কেউ কোন না কোনভাবে বিপুল পরিমাণে লাভবান হবেই।

স্টেশনের শেষ মাথায় সবুজ পতাকাটা উড়তে শুরু করল। যে পতাকায় লাল রং দিয়ে কোন বিপদ সংকেতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পুরোটা কাপড় জুড়ে শুধুই গাঢ় সবুজ রং। যার অর্থ পূর্ণ বৈধতা কিংবা নির্ভয়ে চলার জন্য অনুমতি পাওয়া। অথচ দিনের পর দিন এই সবুজ রং মিথ্যা বলেই চলেছে। বিপদ আর নিরাপদের মধ্যে সমস্ত তফাৎ মুছে দিচ্ছে। ফলাফল; সমাজ উপহার হিসেবে পাচ্ছে একের পর ভয়ংকর সব দূর্ঘটনা। তবুও আমরা কেন যেন অপ্রিয় সত্যগুলো গোপন রেখে অন্ধের মতো মিথ্যুকদের বিশ্বাস করতেই অভ্যস্থ।

উস্তাদ গফুর সাহেব ইঞ্জিনের উপর হাত রাখতেই ট্রেনটা ছুটতে শুরু করল। উনার সাথে এই যন্ত্রটার গভীর সম্পর্ক। যেন উনার সব অনুভূতি হৃদয়হীন এই যন্ত্রটা বুঝতে পারে। অথচ আজকাল মানুষ মানুষের যন্ত্রনা বুঝতে পারে না। পোষা প্রাণী মানুষকে সঙ্গ দেয় আমৃত্যু। কিন্তু মানুষ মানুষকে সঙ্গ দিতে পারে না, ছেড়ে চলে যায়। কারনে চলে যায়, অকারণে চলে যায়। অনেকেই আবার বড্ড তাড়াতাড়ি চলে যায়।

ট্রেন যেই বিজ্ঞানের অংশ সেই বিজ্ঞান বলে, এক সঙ্গে থাকতে থাকতে একজন আরেকজন দ্বারা নিজের অজান্তেই প্রভাবিত হয়। তাহলে কি ট্রেনটার পক্ষে কখনো মানুষের প্রকৃতি আয়ত্ত করা সম্ভব হবে? সে কি পারবে মানুষের মতো করে বেইমানি করতে? অবিকল মানুষের মতো করে বিশ্বাসঘাতকতা

করতে? পারবে হুবহু মানুষের মতো হিংস্র হয়ে উঠতে? কিংবা ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠতে?

নান্দিনা স্টেশন পার হয়েই গফুর সাহেব কিছুক্ষণের জন্য মতি মিয়ার কাঁধে ট্রেনের দায়িত্ব তুলে দেন। এটা একটা অবধারিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। মতি মিয়াও যেন এই সময়টার অপেক্ষায় থাকে। জামালপুর থেকে নান্দিনা পর্যন্ত আসতে আসতে মতি মিয়া কই মাছের মতো ছটফট করতে থাকে। আর ভাবতে থাকে কখন নান্দিনা স্টেশন পার হবে। শুধুমাত্র ওই সময়টুকুই যেন আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব মেনে চলে। ট্রেন জোরে চললেও মনে হয় আস্তে চলছে।

নান্দিনা স্টেশন পার হওয়া মাত্রই গফুর সাহেব মতি মিয়াকে বলেন, "বহ দেহি, আমি একটু জিরাই"। তখনি মতি মিয়ার চোখে মুখে ফুটে ওঠে ধৈর্য আর অপেক্ষার মিষ্টি ফল হাতে পাওয়ার আনন্দ। প্রথমেই মতি মিয়া কারচুপি করে ট্রেনের গতি কিছুটা কমিয়ে দেয়। যাতে করে আরও একটু বেশি সময় সে চালকের আসনে থাকতে পারে।

মতি মিয়া স্বপ্ন দেখে একদিন সে সহকারী চালক থেকে প্রধান চালক হবে। তাকেও সবাই উস্তাদ বলে ডাকবে। সেই স্বপ্ন পূরণের জন্য সিলেটের শাহপরাণ মাজারে গিয়ে সে মান্নত করে এসেছে। যে দিন তার পদোন্নতি হবে সেদিনই সে মাজারে সিন্নি দিবে। অবশ্য তার ছেলেমেয়ে, শ্বশুরবাড়ির লোকজন, নিজের এলাকার লোকজন এমনকি তার স্ত্রীও তাকে ড্রাইভার বলেই জানে। সত্যি বলতে, সমাজে আজকাল নিজের সম্পর্কে একটু বেশী না বললে স্ট্যাটাস মেইনটেইন করা যায় না। এটা অবশ্য মতি মিয়ার একার সমস্যা না। মেধার চেয়ে সার্টিফিকেটকে মূল্যায়ন করা আবাল বাঙালীর নিষ্পাপ দোষ। অবশ্য সার্টিফিকেট ছাড়া নিশ্চিন্তে বংশবিস্তার করা জাতির মেধার মূল্যায়ন করাটাও দুষ্কর। তাই এক্ষেত্রে সার্টিফিকেট হলো necessary evil.

গফুর সাহেব শ্বাস নেন না। ট্রেন থেকে তাকিয়ে থাকেন একটা বাড়ি দেখার অপেক্ষায়। পিয়ারপুর স্টেশনের পরই সেই বাড়িটা। চারদিকে উঁচু দেয়াল করে ঘেরা। আশে পাশে আর কোন বাড়ি নাই। শুধুই ধানক্ষেত আর হওয়া। দোতলা সেই বাড়িটার রং হলদে সাদা। শুধু এই রংটার জন্যই যেন বাড়িটাকে স্বর্গ মনে হয়। রেললাইন থেকে মাত্র ২০০ গজ দূরে। অবশ্য রেললাইনের সাথে

একটা ছোট্ট রাস্তা করে বাড়িটার সাথে সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এতে বাড়িটার সৌন্দর্য আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে।

এই বাড়িটার প্রতি গফুর সাহেবের দূর্বলতা আছে। দেখা মাত্রই তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে। মনে মনে ভাবেন যদি ঐ বাড়িটার ছাদে দাঁড়িয়ে বুক ভরে উত্তরের বাতাস নিতে পারতাম কিংবা বিকেলের বৃষ্টিতে একটু ভিজতে পারতাম। যদি রাতের বেলা দোতলার ছাদে বসে জ্যোৎস্না দেখতে পারতাম। চারদিকের ধানক্ষেত থেকে জোনাকি পোকারা এসে ভীড় করত। তবে তিনি জানেন তার এই চাহিদা খুব সামান্য হলেও পূরণ হওয়া সম্ভব না।

চাকরির এত বছরে গফুর সাহেব ঐ বাড়ি থেকে কখনোই কাউকে ঢুকতে বা বের হতে দেখেননি । দেখবেন কি করে? তিনিতো ভোর বেলা আর সন্ধ্যায় ডিউটি করেন। একবার তিনি মতি মিয়াকে বলেছিলেন, "দেখেছ, বাড়িটা দেখতে কত সুন্দর!"

মতি মিয়া হাসতে হাসতে বলেছিল, "ওস্তাদ যে কি কন? ঐটা তো কোন বাড়ি না। কাচারিঘর। সরকারি অফিস। আমগরে এলাকাতেও এমন কাচারিঘর আছে। সেইটার নাম ৯ নং চরপক্ষীমারি ভূমি অফিস।"

মতি মিয়া অবশ্য ভুল বলেনি। ভূমি অফিসের ডিজাইন এমনই হয়। তবে গফুর সাহেবের দৃঢ় বিশ্বাস ঐটা কাচারিঘর না। ঐটা একটা বাড়ি। কারণ সরকারি, আধা সরকারি কিংবা বেসরকারি যে কোন অফিস অথবা ভবনে সেটার নাম পরিচয় লেখা থাকে। কিন্তু ঐখানে তেমন কোন কিছুই লেখা নাই।

আজ পিয়ারপুর স্টেশন পার হতেই গফুর সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। উনার চোখদুটো রসগোল্লার মতো বড় হয়ে গেল। এত বছর ধরে তিনি যেটা কখনো দেখেননি আজ সেটা চোখের সামনে ঘটছে। এত বছরের রহস্যের সমাধান হচ্ছে। একটি পরিবার সেই বাড়িটা থেকে বের হয়ে আসছে। যাদের মাঝে নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়ে, শিশু বাচ্চা সব বয়সের মানুষই আছে। সবাই খ্রিস্টান পাদ্রীদের পোশাক পড়া। অর্থাৎ এটা কোন খ্রিস্টান পরিবারের বাড়ি। গফুর সাহেব এক মুহূর্তেই বুঝতে পারলেন কেন এই বাড়িটা অন্যসব বাড়ি থেকে দূরে? একা এবং আলাদা।

গতি কম থাকায় ট্রেনটা ধীরে চলছে। দূর থেকে গফুর সাহেব পাদ্রীদের দেখছেন। সবাই একে একে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেটের সামনে জড়ো হয়ে

দাঁড়াল। ছোট ছোট বাচ্চা দুটোকে একদম নিষ্পাপ ফেরেস্তার মতো লাগছে। সবাই কত পরিপাটি! মনে হচ্ছে একদম নতুন পোষাক পড়েছে। হয়তো নতুন পোষাকই হবে। হতে পারে আজ তাদের জন্য বিশেষ কোন দিন।

গফুর সাহেবের খ্রিস্টান ধর্ম সম্পর্কে বিন্দুমাত্র কোন জ্ঞান নেই। তাই খ্রিস্টান ধর্মের বিশেষ দিন সম্পর্কে তার জানার কথাও না। শুধু জানেন ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। কিন্তু আজ ২২ ডিসেম্বর। সম্ভবত তারা বড়দিন উৎযাপনের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবার শেষে বাড়ি থেকে একজন ভদ্রমহিলা বের হলেন। তিনিই বাড়িটার গেটে তালা দিলেন। এরপর সবাই একসাথে হাঁটতে শুরু করল।

পুরুষটি সবার পেছনে। চারজন ভদ্রমহিলা সামনে। তাদের মধ্যে দুজন ভদ্রমহিলা বাচ্চা দুটির হাত ধরে আছে। বাড়ি থেকে রেললাইনের রাস্তা ধরেই ওরা হেঁটে আসছে। ট্রেন যত কাছে আসছে ধীরে ধীরে ওদের হাঁটার গতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজকাল কেউ সহজে ট্রাফিক সিগন্যাল মানতে চায় না। জীবনের চেয়ে সময়কেই বেশী মূল্যায়ন করে। অনেকেই ট্রেন আসতে দেখেও দৌড়ে রাস্তা পার হয়।

গফুর সাহেবের মনে হচ্ছে এরাও লাইনক্রস করবে। তিনি মতি মিয়াকে হর্ণ দিতে বললেন। মতি মিয়া হর্ণ দিল। কিন্তু তারা বেপরোয়া। যেন হর্ণের শব্দ শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সেই শব্দ তাদের কানের কাছে পৌঁছাতেই তারা আরও দ্রুত হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সবাই রেললাইনে এসে পৌঁছাল। চারদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল? তারপর ওরা যেটা করল সেটা দেখার জন্য গফুর সাহেব কিংবা মতি মিয়া কেউ প্রস্তুত ছিল না।

মতি মিয়া ভেবেছিল পাদ্রীরা হয়তো রেললাইনের পাশে দিয়ে হেঁটে চলে যাবে কিংবা রেললাইন অতিক্রম করবে। কিন্তু না, তারা সবাই রেললাইনে বসে পড়ল। একজন পুরুষ, চারজন মহিলা আর দুটো শিশু পাশাপাশি রেললাইনে বসে পড়ল। তারা প্রত্যেকেই একে অপরের হাত ধরে আছে।

মতি মিয়া এক নাগাড়ে ট্রেনের হর্ণ দিয়েই যাচ্ছে। গফুর সাহেব বুঝতে পারছেন না কি করবেন? উনার হাত পা কাঁপছে। চাকরি জীবন শেষ হতে চলল কিন্তু এমন ঘটনার মুখোমুখি তিনি কখনো হননি। পৃথিবীর কেউ হয়তো হয়নি। হঠাৎ উনার মনে পড়ল ট্রেনের ইঞ্জিন বন্ধ করা দরকার। তিনি সেটাই করলেন।